ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

নীল আন্দোলনে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

*ড. মোঃ রেজাউল করিম

সারসংক্ষেপ: ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে নীল চাষিদের আন্দোলন একটি অতি পরিচিত ও বহুল আলোচিত বিষয়। গবেষকগণ একে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১] তবে, গবেষকগণ আন্দোলনটিতে খ্রিস্টান মিশিনারিদের ভূমিকাকে দেখেছেন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকার সমান্তরাল করে। এসব আলোচনায় মিশনারিদের ভূমিকা শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একথা সত্য যে, মিশনারিরা আন্দোলনকারী চাষিদের পক্ষে কোলকাতা ও লন্ডনে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা চালায়। কিন্তু এদের ভূমিকা শহুরে কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, এমন নয়। বরং তা গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মূলত আন্দোলনকারী চাষিদের সামনে প্রেরণার উৎস ছিলো মফঃস্বলের মিশনারিরা। আন্দোলনে এদের ভূমিকা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে নীল আন্দোলনে মফঃস্বলের মিশনারিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে এদের শহুরে কর্মকাণ্ডও পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাওয়া যাবে। তবে মূল আলোচনায় যাবার আগে বাংলায় নীল চাষ ও নীল আন্দোলন, এদেশে মিশনারিদের আগমন ও বঙ্গীয় সমাজে এদের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে।

১. বাংলায় নীল চাষ ও নীল আন্দোলন

নীল এক ধরনের রঞ্জকের নাম। কাপড়ের রঙের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে নীল ব্যবহার করা হতো। পাট জাতীয় এক ধরনের গাছ থেকে নীল তৈরি হতো। পৃথিবীতে অনেক ধরনের নীলগাছ জন্মাতো। প্রজাতিগত সামান্য ভিন্নতার জন্য এসব উদ্ভিদের নামও ভিন্ন ছিলো। যেমন ইন্ডিগোফেরা ট্রাক্সিলেন্সিস, ইন্ডিগোফেরা এনিল, ইন্ডিগোফেরা আর্জিন্টিয়া, ইন্ডিগোফেরা টিঙ্কটোরিয়া প্রভৃতি। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলো ইন্ডিগোফেরা টিঙ্কটোরিয়া।[২] ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে নীল জন্মাতো। তবে, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বাংলায় নীল চাষ তেমন হয়নি। এদেশে নীল চাষ প্রবর্তন করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার।

ইংল্যান্ডে নীলের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলায় নীল চাষ প্রবর্তন করা হয়। আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। বস্ত্র রঞ্জনের প্রধান উপাদান নীলের চাহিদাও বেড়ে যায়। ঠিক একই সময়ে নীলের সকল উৎস ইংল্যান্ডের হাতছাড়া হয়।[৩] বাংলা তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন। এখানকার আবহাওয়া নীল চাষের অনুকূল। আর খুবই সস্তা শ্রমের মজুরি। এসব বিবেচনায় ইংল্যান্ড বাংলায় নীল চাষের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাপড় রপ্তানির মাধ্যমে এদেশ থেকে ব্রিটেনে অর্থ প্রেরণ করতো। ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্প বিকশিত হবার কারণে আঠারো শতকের শেষের দিক থেকে এ পণ্যটি আর তেমন রপ্তানির প্রয়োজন হয়নি। এতে বাংলা থেকে ব্রিটেনে কোম্পানির অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। কোম্পানি কাপড়ের একটি বিকল্প অনুসন্ধান করতে থাকে।[৪] ব্রিটিশ

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

সরকার বাংলায় নীল চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কোম্পানি একে স্বাগত জানায় এবং বিশেষ আগ্রহ নিয়ে এদেশে নীল চাষ আরম্ভ করে। বাংলার ইতিহাসে নীল চাষের যাত্রা শুরু হয়।

এদেশে নীল চাষের সূচনা লুই বোনার্ড নামক একজন ফরাসি বণিকের মাধ্যমে।[৫] তাঁর পাশাপাশি অনেক ইউরোপীয় নীল চাষে এগিয়ে আসে। সরকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে দাস মালিক নীলকরদের এনে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বসিয়ে দেয়।[৬] সেই সঙ্গে নতুন অভিবাসী ও কোম্পানি কর্মচারিদের নীল চাষে উৎসাহিত করে।[৭] ফলে আঠারো শতকের মধ্যে এদেশে নীল চাষ বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

বাংলায় নীল চাষ হতো দুই ব্যবস্থায়।[৮] নীলকর নিজের তত্ত্বাবধানে নীল চাষ করলে তাকে বলা হতো 'নিজ' আবাদ। এছাড়া নীলকর চাষিদের দাদন দিয়ে নীল চাষ করিয়ে নিলে তাকে বলা হতো 'দাদনি'। দাদনি ব্যবস্থায় নীলকর চাষিকে বিঘা প্রতি দুই রুপি অগ্রিম বা দাদন দিতো।[৯] দাদনগ্রাহী চাষিকে নিজ দায়িত্বে নীল চাষ করে তা কেটে কুঠিতে পৌঁছে দিতে হতো। এক্ষেত্রে নীল চাষের খরচ এবং সব দায়-দায়িত্ব ছিলো চাষির।[১০] নীলকরের নিকট 'নিজ' আবাদের চেয়ে 'দাদনি' চাষ অধিক লাভজনক ছিলো। ফলে তারা দাদনি চাষ বৃদ্ধিতে যত্নবান হয়।[১১] দাদনি চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীল আন্দোলন কালে (১৮৫৯-৬২ সালে) দেখা যায়, বাংলার প্রায় সব নীলই 'দাদনি' চাষে উৎপন্ন হচ্ছে।[১২]

নীল চাষ নীলকরের জন্য লাভজনক হলেও চাষির জন্য ছিলো ক্ষতিকর। নীল চাষ করে চাষির বিঘা প্রতি দুই থেকে তিন রুপি ক্ষতি হতো।[১৩] স্বভাবতই চাষিরা নীল চাষ করতে চাইতো না। নীলকর লাঠিয়াল দিয়ে চাষিদের ধরে এনে জোর করে দাদন দিতো এবং সাদা স্ট্যাম্পে টিপসই নিতো।[১৪] ফলে তারা আইনানুগভাবে নীল চাষে বাধ্য হয়ে পড়তো। অবশ্য এরপরও চাষিরা সহজে নীল চাষ করতো না। নীলকর বল প্রয়োগ করে চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করিয়ে নিতো।[১৫] নীল চাষ না করলে নীলকর চাষিদের উপরে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাতো। নীলকর তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতো। ধরে এনে কুঠিতে আটক রেখে নির্যাতন করতো।[১৬] এই নির্যাতন থেকে এমনকি চাষির স্ত্রী-কন্যারাও রেহাই পেতো না।[১৭]

চাষিদের উপর অত্যাচার শুরু হয় নীল চাষের সূচনালগ্ন থেকেই। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির অত্যাচারের অভিযোগে সরকার চারজন নীলকরের লাইসেন্স বাতিল করে।[১৮] পরবর্তীতে সরকার নীলকরের বিরুদ্ধে আর কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বরং তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। ফলে নীলকরদের অত্যাচার অব্যাহত গতিতে বেড়ে চলে।

নীলকরদের এই অত্যাচার এদেশের চাষিরা যে নীরবে সহ্য করে, তা নয়। এরা তা প্রতিরোধের প্রয়াস পায়। চাষিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নীলকরের লাঠিয়ালদের প্রতিরোধ করে। নীলকরের কর্মচারিদের উপর চড়াও হয়। এমনকি এরা নীলকুঠি পর্যন্ত আক্রমণ করে বসে।[১৯] নীলকরের বিরুদ্ধে চাষিদের এই সংগ্রাম প্রথমে বিক্ষিপ্ত আকারে সংঘটিত হয়। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে চাষিরা ক্রমান্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হলে নীল আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করে।

নীল চাষ ও নীল আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিকে প্রভাবিত করে। এদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত খ্রিস্টান মিশনারিরাও এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়। নীলকরের বিরুদ্ধে চাষিরা আন্দোলন শুরু করলে মিশনারিরা তাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নীল আন্দোলনে মিশনারিদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। অবশ্য, এর আগে বঙ্গীয় সমাজে এদের অবস্থান অবলোকন করা জরুরি।

২. বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারি

বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারিদের আগমন পনেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।[২০] আঠারো শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর মিশনারিরা এদেশে ধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ পায়। এদেশে অধিক সংখ্যক মিশনারি আসতে আরম্ভ করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে এদেশে মিশনারি কার্যক্রম আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করে।[২১] এতে এদেশে মিশনারিদের আগমন বৃদ্ধি পায়। ক্রমান্বয়ে মিশনারি কার্যক্রম দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ক্যাথেড্রাল মিশন, কির্ক অব স্কটল্যান্ড মিশন, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড মিশন এবং সোসাইটি ফর দি প্রপাগেশন অব দি গস্পেল এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গির্জা স্থাপন করে ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়।[২২] উল্লিখিত চার্চসমূহ উনিশ শতকের বিশের দশকের[২৩] মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই সঙ্গে অন্যান্য চার্চের আগমনও অব্যাহত থাকে। শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার ৭১টি স্থানে এসব মিশন কর্মরত ছিলো। এর মধ্যে ৩০টি চার্চ ছিলো কোলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। বাকি চার্চগুলো ছিলো মফঃস্বলে, বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে।[২৪]

উনিশ শতকে বাংলায় ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত মিশনারিদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য, সমসাময়িক কালের উৎস থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির ধর্ম যাজকের সংখ্যা জানা যায়। শুধু এই একটি মিশনেরই ৯৩ জন যাজক ভারতের ৩৬ স্থানে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করতো। এরা বেশ কিছু মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির হিসেব মোতাবেক উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলায় দেশীয় খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিলো সাড়ে তিন হাজারের মতো।[২৫] বলা বাহুল্য, এদের সবাই ছিলো ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান।

সমসাময়িক কালের পত্রিকায় বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক ধর্মান্তরিত মানুষের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়।[২৬] পরিসংখ্যানটি ছিলো নিম্নরূপ:

বছর		খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতের সংখ্যা
১৭৯৩-১৮০২	ঃ	২৭
১৮০৩-১৮১২	ঃ	১৬১
১৮১৩-১৮২২	ঃ	৪০৩
১৮২৩-১৮৩২	ঃ	৬৭৫
১৮৩৩-১৮৪২	ঃ	১০৪৫

উৎস: Kanti Prasanna Sen Gupta, *The Christian issionary in Bengal, 1793-1833,* (Calcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1971), p. 143.

উপরের সারণীতে কৃষ্ণনগর জেলার উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের পর ব্যাপকভাবে ধর্মান্তর শুরু হয় মূলত এই জেলা (কৃষ্ণনগর) থেকে।

মিশনারিদের হিসেব মোতাবেক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিলো ১৪০৬।[২৭] এর দশ বছর পরেও বাংলার ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। বস্তুত, এসময়ে কৃষ্ণনগর জেলার বাইরের মানুষ তেমন ধর্মান্তরিত হয়নি। এ জেলার উপাত্ত যোগ করা হলে বাংলার ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানের সংখ্যা আরো খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য, বাংলার বিশাল জনসংখ্যার কথা বিবেচনায় নিলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মান্তরিতকরণে মিশনারিদের সাফল্য কিঞ্চিৎকর।

এদেশে ধর্ম প্রচারে এই সামান্য সফলতার প্রায় পুরোটাই আসে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশিনারিদের মাধ্যমে। মূলত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখার কারণে এরা এক্ষেত্রে সফলতা পায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির ভাষায়, "The main cause of this success was due to establishment of schools in India. They drew an immense attention of the native to their activities, especially to the schools engaged in the diffusion of European education."[২৮]

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কলকাতা এবং এর পাশ্ববর্তী এলাকায় ৪৫টি মিশনারি বিদ্যালয়ে ৩,২৫০ ছাত্র অধ্যয়নরত ছিলো।[২৯] এর বাইরে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে এদের ৫৪টি বিদ্যালয়ে আরো ৩,০০০-এর বেশি ছাত্র পড়াশুনা করতো। এছাড়া চিনসুরায় ৬টি শ্রীরামপুরে মিশনারিদের ১টি বোর্ডিং স্কুল এবং একটি সার্কেল স্কুল ছিলো। কালনা ও কাটওয়াতেও এদের একটি করে বোর্ডিং স্কুল ও সার্কেল স্কুল ছিলো। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না।[৩০]

মিশনারিদের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তৃত হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ৯টি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়ে ৮২৮ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত ছিলো। এর বাইরে মিশনারিদের ইনফান্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ফ্রি স্কুলে ৫০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করতো। এছাড়া, কোলকাতার বাইরে ২২টি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়ে আরো ৭৮২ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত ছিলো।[৩১]

উপরের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে মূলত ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এডামের রিপোর্টের ভিত্তিতে। সে মেতাবেক বাংলায় মিশনারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৪। বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হলেও এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,০০০-এর মতো।[৩২] কিন্তু বাস্তবে মিশনারি বিদ্যালয়ের এবং এসব বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিলো আরো বেশি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির হিসেব মোতাবেক ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিদ্যালয়সমূহে প্রায় ৫০,০০০ শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতো। এর বড়ো অংশ জুড়ে ছিলো মিশনারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় বাংলায় নারী শিক্ষাও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রী সংখ্যা ছিলো ১,২০০

মতো। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,০০০-এ উন্নীত হয়।[৩৩] এক কথায়, মিশনারিরা একটি বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিজেদের বিদ্যালয়ের আওতায় নিয়ে আসে। এদের উপর মিশনারিদের বিশেষ প্রভাব ছিলো। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা মিশনারিদের সম্মানের চোখে দেখতো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটির (১৮৩০ খ্রি.) মতে, "The general diffusion of instruction is producing the best and most salutary effect, not only on the children educated, but on the minds of their parents and neighbours."[৩৪] বলা বাহুল্য, এমন প্রভাবের কারণেই মিশনারিদের পক্ষে চাষিদের সহায়তা দান ও নীল আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়।

৩. নীল আন্দোলন ও খ্রিস্টান মিশনারি

মিশনারিরা দরিদ্র তহবিল থেকে চাষিদের ঋণ প্রদান করে।[৩৫] এটি মিশনারিদের সঙ্গে চাষির সম্পর্ক নিবিড় করে তোলে। চাষিরা সুবিধা-অসুবিধায় তাদের শরণাপন্ন হয়। স্বভাবতই, তারা মিশনারিদের নিকট নীলকরের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। চার্চ মিশনারি সোসাইটির পাদরি রেভারেন্ড জেম্‌স লঙের নিকট চাষিরা অভিযোগ জানিয়ে বলে, "তুমি তোমার স্বদেশী নীলকরদের কম অত্যাচারী হতে বলো না কেন? প্রথমে তাদের হেদায়েত করো।"[৩৬] মিশনারি স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত একই রকম অভিযোগ উত্থাপন করে মিশনারিদের বিব্রত করে। পাদরি লঙকে মিশনারি স্কুলের ছাত্ররা একবার প্রশ্ন করে, "তোমার খ্রিস্টান স্বদেশীরা আমাদের মতো খারাপ কেন? এরপরও তুমি বলছো তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো।"[৩৭] যশোর চূঁড়ামনকাটির ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি জে. এইচ. এন্ডারসনের নিকট চাষিরা একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে। নীলকরদের হাত থেকে রক্ষা করলে তারা এমনকি তাঁর নিকট খ্রিস্টান হবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেয়।[৩৮]

নীলকরদের অত্যাচারে উদ্ভূত পরিস্থিতি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে অত্যাচারমূলক নীল চাষ ব্যবস্থা তিরোহিত করতে মিশনারিরা চাষিদের পক্ষ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা গ্রহণের কারণ সহজবোধ্য। মিশনারিদের লক্ষ্য ছিলো এদেশে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও সম্প্রসারণ। এ উদ্দেশ্যে এরা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।[৩৯] নীল আন্দোলনে অংশগ্রহণের পেছনেও এদের উদ্দেশ্য একই। বস্তুত, নীলকরদের অত্যাচারের কারণে মিশনারিরা বিরূপ অবস্থার মুখোমুখি হয়। এদেশে খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য ও খ্রিস্টানদের মহৎ চারিত্রিক আদর্শের কথা প্রচার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মিশনারিরা এ অবস্থা পরিবর্তন করতে চায়। নীলকরদের অত্যাচার থেকে চাষিদের মুক্তিদানে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে বলে এরা মনে করে। বলা বাহুল্য, চাষিদের ধর্মান্তরিত হবার প্রতিশ্রুতি এক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করে। ফলে এরা চাষিদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

মিশনারিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও সাংগঠনিকভাবে চাষিদের সহায়তা দেয়। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চার্চ ভূমিকা রাখে। অবশ্য এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চার্চ মিশনারি সোসাইটি।[৪০] এটি একটি লুথারপন্থী জার্মান চার্চ।[৪১] এই চার্চের তিনজন যাজক-রেভারেন্ড ক্রিশ্চিয়ান বমভেইট্‌স, জে.জে. লিঙ্কে এবং ফ্রেডারিক শুর নীল আন্দোলনে বিশেষ

অবদান রাখেন।[৪২] এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন বমভেইট্স।[৪৩] তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিলো নিশ্চিন্তপুর কনসার্নের নীল চাষ এলাকায়।[৪৪] এই কনসার্নটির সদর কুঠি ছিলো মাগুরার মহম্মদপুর থানায়।[৪৫]

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ক্রিশ্চিয়ান বমভেইট্স নীল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি চাষিদের পরামর্শ দেন যে, নীল চাষে বাধ্য করার কোনো আইন নেই। অতএব, দাদন গ্রহণ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তারা ইচ্ছা করলে দাদন গ্রহণ করতে বা না করতে পারে।[৪৬] এছাড়া তিনি কোলকাতায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট এবং ইন্ডিয়ান ফিল্ড নামক দু'টি পত্রিকায় নীল চাষ পদ্ধতির নিন্দা করে পত্র প্রেরণ করেন। এসব পত্রে তিনি নিশ্চন্তপুরে নীলকরের অত্যাচারের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন।[৪৭]

চাষিদের পক্ষে ভূমিকা রাখায় নীলকররা বমভেইট্সের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এরা চিরায়ত স্বভাবে তাঁকে আক্রমণ করে বসে। বমভেইট্সের বাঙালি মেয়ে বিয়ে করা নিয়ে এরা সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। এরা এমনকি বমভেইটসের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রচণ্ড অপমানজনক মন্তব্য করে। ইংলিশম্যান পত্রিকায় জনৈক নীলকর লিখেন:

> This creature of circumstances, who has arisen . . as the *scarfoeus* emerges from his native dung, is not an Englishman; his name bespeaks him a denizen of the filthy *juden-strasse* of some obscure little German Dorf where he fattened upon rye bread with occasional feasts of *sour-krout* and a stray taste of greasy *wurtzel*.[৪৮]

এরকম পরিস্থিতিতে বমভেইট্স নীল আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা অস্বীকার করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, নীল চাষে বাধ্য করার কোনো আইন নেই- সে কথা তিনি চাষিদের জানিয়ে দিয়েছেন।[৪৯]

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বমভেইট্স নিশ্চিন্তপুরে ছিলেন না। তাঁর স্থলে নিয়োজিত ছিলেন রেভারেন্ড জে.জে. লিঙ্কে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিশ্চিন্তপুর কনসার্ন চাষ বৃদ্ধি করে। এসময়ে মেলিয়াপট্টি নামক একটি খ্রিস্টান পল্লি নীল চাষের আওতায় আসে। পল্লিটির খ্রিস্টান অধিবাসীদের উপর নীল কুঠির কর্মচারিরা অত্যাচার চালায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লিঙ্কে আদালতে মামলা দায়ের করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নীলকররা মিশনারিদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। তারা মিশনারিদের উত্থাপিত কোনো অভিযোগ শুনতে অস্বীকৃতি জানায়। মিশনের ঋণ তহবিল থেকে নেওয়া অর্থ পরিশোধ না করে মিশনারিদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য তারা চাষিদের প্ররোচিত করে।[৫০] নীলকরদের গৃহীত এসব ব্যবস্থায় লিঙ্কে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, দরিদ্র ও অত্যাচারিত মানুষ একদিন নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করে বিশাল জোট গড়ে তুলবে।[৫১]

শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিশনারিরা চাষিদের সহায়তা করে, এমন নয়। সাংগঠনিক ভাবেও বিভিন্ন মিশন চাষিদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলায় কর্মরত সকল মিশনারি এবং মিশনের লক্ষ্য ছিলো এদেশে খ্রিস্টধর্মের সম্প্রসারণ। মিশনারিরা

এক্ষেত্রে বিরাজমান অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করার প্রয়াস পায়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নীলের বিষয়টি আলোচনায় স্থান পায়। সম্মেলনে "খ্রিস্টধর্ম সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নীল চাষের প্রভাব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধটিতে বলা হয়, খ্রিস্টধর্মের প্রচারণা এবং নীল চাষ পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়। নীলকরদের অত্যাচার খ্রিস্ট্রধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মিশনারিগণ এ সিদ্ধান্তে একমত হন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ২৫ জন মিশনারি সম্মিলিত ভাবে বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের নিকট একটি আবেদনপত্র পেশ করে। এরা ঔপনিবেশিক ভারতে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে বলে আবেদনে উল্লেখ করে। মিশনারিরা এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনেরও দাবি জানায়। এরা পুলিশ ও বিচার বিভাগের কার্যকারিতা তদন্তের কথাও আবেদনপত্রে উল্লেখ করে।[৫২] অবশ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর এসময়ে তাদের আবেদনে সাড়া দেননি।

চার্চ মিশনারি সোসাইটির পাদরি রেভারেন্ড জেমস লঙ মিশনের লন্ডনস্থ কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে ভারতীয় উপনিবেশ সংক্রান্ত সংসদীয় সিলেক্ট কমিটির নিকট নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরেন।[৫৩] তিনি লন্ডনের প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকেও বিষয়টি অবহিত করেন। এছাড়া কোলকাতায় মিশনারিদের সম্মেলনে তিনি জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচার খ্রিস্টান ধর্মের সম্প্রসারণকে কীভাবে ব্যাহত করছে তা বুঝিয়ে দেন।[৫৪]

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মিশনারিদের সম্মেলনে নীল আন্দোলনে মিশনারিরা সম্পৃক্ত হবে কি না, সে বিষয়ে আলোচনা হয়।[৫৫] সিদ্ধান্ত হয় যে, মিশনারিরা নীলকরদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভে চাষিদের সহায়তা প্রদান করবে। মিশনারিদের এই ব্যবস্থা নীলকরদের ভাবিয়ে তোলে। তারা এক্ষেত্রে সাহায্য লাভের আশায় কোলকাতার বিশপের শরণাপন্ন হয়।[৫৬] তারা নীল আন্দোলনে চাষিদের সহায়তা না করার জন্য মিশনারিদের প্রতি অনুরোধ জানায়। সেই সঙ্গে নীলকররা মিশনারিদের নিকট নীল চাষে সহায়তা দানের নিবেদন করে। অবশ্য বিশপ নীলকরদের আবেদনে সাড়া দেননি। সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়ে নীলকররা মিশনারিদের প্রতি বৈরি ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।[৫৭] এরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে মিশনারিদের আক্রমণ করে। এমনকি তারা মিশনারিদের চারিত্রিক বিষয়েও আঘাত করে বসে।[৫৮] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে একটি পত্রিকায় লিখা হয়:

> Where is the German's fatherland?" Is a question we have heard with all sorts of replies. . . . the wandering German of the very lowest class being nearly as unwelcome an intruder upon strange soils as the Chinaman and for very much the same reasons... [Some] seem to have established themselves with great effect in the benighted district of Kisnaghur. Schurr, Lincke, Bomwetsch and Blumhardt are names long known and far famed among the oppressed of the land. . . . Germans have no right to conspire against the Englishman, particularly the English settler...[৫৯]

বাংলায় কর্মরত অধিকাংশ মিশনারি ছিলো জার্মান। নীলকরদের এমন প্রচারণা নীলকর-মিশনারি সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

নীলকর-মিশনারি দ্বন্দ্বে নীল দর্পণ মামলা নতুন মাত্রা সংযোজন করে। দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীল দর্পণ নাটকটি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সমাজে গ্রন্থটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। মিশনারি রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ বাংলা সরকারের সচিব সেটন-কারকে নীল দর্পণের একটি কপি প্রদান করেন। সচিব মহোদয় যেন এদেশে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে সম্যকভাবে ধারণা পেতে পারেন, সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যে লঙ তাঁকে গ্রন্থটি সরবরাহ করেছিলেন। সেটন-কার গ্রন্থটি পাঠ করেন। এরপর লেফটেন্যান্ট গভর্নর পিটার গ্র্যান্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা গ্রন্থটি পাঠ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ফলে এটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মিশনারি জেমস লঙ নাটকটি অনুবাদের দায়িত্ব নেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কথিত আছে যে, কবি এক রাতে নাটকটির অনুবাদের কাজ শেষ করেন। যাহোক, জেমস লঙের তত্ত্বাবধানে নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে নাটকটি বিতরণ করা হয়। ভারত ও ইংল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদেরকেও এর কপি দেওয়া হয়। গ্রন্থটি প্রকাশ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় সরকারি খরচে।[৬০]

নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশের পর নীলকররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরা নাটকটির নাট্যকার ও এটি প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের খোঁজ করতে আরম্ভ করে। নীল দর্পণ নাটকে নাট্যকারের নাম ছিলো না। এর ইংরেজি সংস্করণে নাট্যকার, অনুবাদক বা প্রকাশক-কারোর নামই সন্নিবেশিত হয়নি। তবে, মুদ্রাকর সি এইচ ম্যানুয়েলের নাম এতে উল্লিখিত ছিলো। নীলকররা তার নামে আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করে।[৬১] অবশ্য এ মামলায় ম্যানুয়েলকে তেমন ভোগান্তির শিকার হতে হয়নি। মামলাটি তার উপরে বর্তানোর আগেই জেম্‌স লঙ নাটকটি প্রকাশের সার্বিক দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নেন। ফলে ম্যানুয়েল মামলা থেকে নিষ্কৃতি পান। মামলাটি লঙের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯, ২০ ও ২৪ জুলাই আদালত নীল দর্পণ মামলার শুনানি গ্রহণ করে। এতে লঙ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন:

> These persuits, along with my interest in the rural population, called my attention to the vernacular press of India, its uses and defects, as well as its being an exponent of the native mind and feeling. It is in connection with the latter branch of my labors, that I appear here to-day as publisher of the *Nil Durpon*, Which I edited with the view of informing Europeans of influence, of its contents, as giving native popular opinion on the Indigo question.[৬২]

বিচারক তাঁকে মাঝ পথে থামিয়ে দেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে তিনি লঙকে দোষী সাব্যস্ত করেন। নীল দর্পণ নাটকের অনুবাদ প্রকাশের দায়ে তাঁকে ১ হাজার রুপি জরিমানা এবং ১ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ সময়ে বেশ ক'জন বিশিষ্ট নাগরিক আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতের এমন রায়ে এরা মর্মাহত হন। এদের

মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নীল দর্পণ মামলার রায় শোনার জন্য তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লঙের পক্ষে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করে দেন।

নীলদর্পণ নাটক প্রকাশের দায়ে লঙের কারাবরণ ইংল্যান্ড এবং ভারতের মানুষের অনুভূতিকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। ইংল্যান্ডের মানুষের মন থেকে নীলকরদের প্রতি সহানুভূতির শেষ বিন্দুটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে, বাংলার সকল শ্রেণির মানুষ নীলকরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। এরা বিশেষ করে কোলকাতার শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এক অভাবনীয় ঐক্যের সূচনা হয়। এরা মামলার বিচারক ওয়েল্সকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদন জানায়। ওয়েল্স ইউরোপীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন বলে এরা অভিযোগ উত্থাপন করে। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ওয়েলস জনসমক্ষে, এমনকি আদালতে বসে ভারতীয়দের সম্পর্কে ঘৃণাভরা মন্তব্য করেন। ইতঃপূর্বে ওয়েলস আদালতে বসে বাঙালিদের মিথ্যা হলফকারী ও জালিয়াতের জাতি বলে মন্তব্য করেছিলেন।[৬৩] আবেদনকারীরা প্রসঙ্গত সে কথাও ভারত সচিবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবেদনপত্রটিতে কোলকাতার সব শ্রেণির মানুষ স্বাক্ষর প্রদান করে। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ৫০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেও এর (আবেদনপত্রটির) একটি কপি সংগ্রহ করতে পারেননি।[৬৪] বলা বাহুল্য, লঙের রায় বাঙালিদের কতোটা ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছিল, এ ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নীলদর্পণ মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাবরণ করায় লঙ বাঙালির হৃদয়ে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। গ্রামীণ ছড়া ও প্রবাদে লঙের সরব উপস্থিতি এর সপক্ষে প্রমাণ। একটি গ্রামীণ ছড়ায় লঙকে স্মরণ করা হয়েছে এভাবে-

> নীল-বাঁদরে সোনার বাঙালা করলে এবার ছারেখার!
> অসময়ে হরিশ ম'লো, লং-এর হল কারাগার
> প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।[৬৫]

মিশনারিদের সহযোগিতা নীল চাষিদের আন্দোলনে উজ্জীবিত করে। এতে নীল আন্দোলনে বিশেষ গতি সঞ্চার হয়। মিশনারিদের প্রচারণা ভারত ও ইংল্যান্ডের মানুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এরা ক্রমান্বয়ে নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এছাড়া মিশনারিদের দাবির মুখে সরকার নীল কমিশন গঠন করে। কমিশনের রিপোর্টে নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের চিত্র প্রকাশিত হয়। ফলে সরকার নীলের প্রশ্নে অবস্থান পরিবর্তন করে। 'নীল চাষ করা ঐচ্ছিক বিষয়' বলে সরকার ঘোষণা দেয়। নীল চাষির সংগ্রাম সফলতা লাভ করে।

উপসংহার

বাংলার নিরীহ চাষির উপরে নীলকরের শোষণ ও অত্যাচার এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পরিবেশ বিনষ্ট করে। মিশনারিরা এ অবস্থাটি পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায়। চাষিরা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে এমন ধারণাও মিশনারিদের এক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে। এরা আন্দোলনকারী চাষিদের প্রতি সহায়তার হাত

বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য, চাষিদের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোকে আঘাত করে, সঙ্গত কারণেই মিশনারিরা তা চায়নি। তা সত্ত্বেও মিশনারিদের ভূমিকা নীল আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং একে সফল করে তুলতে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়।

তর্থসূচি:

---

১ অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের মতো নীল আন্দোলন বিশ্লেষণকারী গবেষকদের সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, নব্য-মার্ক্সবাদী, সাবঅল্টার্ন প্রভৃতি ঘরাণায় বিভক্ত করা যায়। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Nurul H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal: The Faraizi, Indigo and Pabna Movements,* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2001), pp. 1-5.)

২ George Watt, *Commercial Product of India,* (London: John Murry, 1908), p. ৬৬০

৩ D.H Buchanan, *Developement of Capitalistic Enterprise in India*, (London: Frank Cass & Co., 1966), 1st Pub., 1934, p. 36; Blair B. Kling, *The Blue Mutiny: Indigo Disturbances in Bengal,* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1966), pp 15-16; Benoy Chowdhury, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal*, Vol. I, (Calcutta: Indian Studies; Past and Present, 1964), p. 74

৪ মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল চাষ: নীলকর নীলচাষি সম্পর্ক*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১০), পৃ. ৫৭

৫ সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* (কলিকাত: বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৯৬), পৃ. ৮৬; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (কলিকাতা: শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫), পৃ. ৭৬৭; প্রমাদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ*, (কলিকাতা: র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ১৯৭৮), পৃ. ৫; কুমুদ নাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৮৬), পৃ. ৩৯২

৬ Holden Furber, *John Company at Work: A Study of European Expansion in India in the Late Eighteenth Century,* (Cambridge: Harvard University Press, 1951), pp. 291-292; D.H Buchanan, *op.cit*., pp. 37-38

৭ মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২: একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১১৬

৮ *Calcutta Review*, January-December, 1847, Vol. VII, p. 206 Ges December, 1858, Vol. XXXI, p. 33

৯ *Report of the Indigo Comission Appointed under Act XI of 1860: Minute of Evidence, 1860,* Question No. 3832. [এরপর থেকে রিপোর্টটির জন্য RIC Ges Question বুঝাতে Q ব্যবহার করা হবে]; *Calcutta Review*, March, 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, pp. 33-34; প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

১০ *Calcutta Review*, March, 1847, Vol. VII, p. 206

১১ Benoy Chowdhury, *op.cit.*, p. 126

১২ RIC Appendix I; *Calcutta Review*, March, 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, pp. 33-34; প্ররমাদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮

১৩ মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮

১৪ letter from J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under Secretary to

the Government of Bengal (Dated the 31st December 1859), *Selections from the Records of the Government of Bengal, No. XXXIII, Papers Relating to the Cultivation of Indigo in Bengal,* Pt. I, (Calcutta: Bengal Secretariat Office, 1860) [এরপর থেকে SRGB *Indigo* হিসেবে উল্লেখ করা হবে], p. 233

১৫ RIC Q 582. SRGB *Indigo*, p. 233

১৬ সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮২-৭৮৩

১৭ *Hindoo Patriot*, August 22, 1860

১৮ H.R. Ghoshal, *Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833,* (Calcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1966), p. 18; Blair B. Kling, *op.cit.*, p. 40

১৯ মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল আন্দোলন*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭-১৫৮

২০ ভারতের সাথে খ্রিস্টান মিশনারিদের সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। কথিত আছে, খ্রিস্টীয় ৫০ শতকে সেন্ট টমাস নামক জনৈক মিশনারি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। তিনি মালবার উপকূলে কিছু মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হন। তবে, মিশনারিরা বাংলায় আসে এর অনেক পরে, ষোড়শ শতকের সত্তরের দশকে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জেসুইট মিশনারি ফাদার এন্টনি ভাজ এবং ফাদার পিটার ডায়াসের আগমনের মাধ্যমে এদেশে মিশনারি কার্যক্রমের সূচনা হয়। রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা এদেশে আসে এরও ক'বছর পরে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে। দেখুন, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৩, (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ১০৪

২১ Blair B. Kling, *op.cit*., p. 40

২২ মোহার আলী তাঁর আলোচনায় কির্ক অব স্কটল্যান্ড মিশন এবং নূরুল এইচ চৌধুরী সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব দি গস্পেলকে বাদ দিয়েছেন। (দেখুন, Muhammad Mohar Ali, *The History of the Muslims of Bengal,* Vol. IIA, (Ryadh: Ibn Saud Islamic University, 1985), p. 205; Nurul H. Choudhury, *op.cit*.,p. 93)

২৩ উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর।

২৪ Muhammad Mohar Ali, *op.cit*., p. 206

২৫ *British Parliamentary Papers, Select Committee Report, Colonies East India 1859,* (Irish University Press, 1969), (এর পর থেকে BPP হিসেবে উল্লেখ করা হবে) Vol. IV. p. 344

২৬ *Calcutta Review* পত্রিকায় নাম না জানা লেখকের *The Missionary Labour in India* শীর্ষক প্রবন্ধে পরিসংখ্যানটি সন্নিবেশিত আছে। কান্তি প্রসন্ন সেন গুপ্ত উক্ত লেখককে জনৈক মিশনারি লে মনে করেন। (দেখুন, Kanti Prasanna Sen Gupta, *The Christian Missionary in Bengal, 1793-1833,* (Calcutta: Firma KL Mukhopadhyay, 1971), p. 143.)

২৭ *Ibid*.

২৮ BPP, Vol. 5, p. 22

২৯ Kanti Prasanna Sen Gupta, *op.cit.,* p. 102

৩০ *Ibid*, pp. 101-102

৩১ *Ibid*, pp. 102

৩২ *Ibid*.

৩৩ BPP, Vol. 5, p. 22

৩৪ BPP, Vol. 5, p. 22

৩৫ Blair B. Kling, *op.cit*., p. 101

৩৬ ÒWhy do you not tell your countrymen, the indigo planters, to be less oppressive; go preach to them first", RIC Q 1625

৩৭ "Why are your Christian countrymen as bad as we are, and yet you say, your religion is better than ours", RIC Q 1625

৩৮ চাষিরা এন্ডারসনকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, "Save us from oppression of the planters and then we may become Christians", (দেখুন, RIC Q 870.)

৩৯ Nurul H. Choudhury, *op.cit.*, p. 93

৪০ *Ibid*.

৪১ *Ibid*., pp. 140-141

৪২ Blair B. Kling, *op.cit*., p.98

৪৩ *Ibid*.,99

৪৪ *Ibid*., p. 100

৪৫ Ramshunker Sen, *Report on the Agricultural Statistics of Jessore*, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1873), p. 19

৪৬ Blair B. Kling, *op.cit*., p., 100

৪৭ *Ibid*.

৪৮ *Englishman,* June 5, 1860; D×…Z, Blair B. Kling, *op.cit*., p., 100.

৪৯ Blair B. Kling, *op.cit*., p. 100.

৫০ *Ibid*., p. 101

৫১ *Ibid*.

৫২ M.K. Chanda, "The Indigo Revolt and Christian Missionaries," *Bengal Past and Present*, Vol. CII, Pts. I, and II, January-December 1984, pp. 159-160; D×…Z, Nurul H. Choudhury, *op.cit*., p. 95

৫৩ Blair B. Kling, *op.cit*., pp., 122

৫৪ শঙ্কর সেনগুপ্ত, *পাদ্রী লঙ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন*, (কলিকাতা: ১৯৮০) পৃ. ১৩০-১৩১; D×…Z, Nurul H. Choudhury, *op.cit*., p. 96

৫৫ Blair B. Kling, *op.cit*., pp., 122-123

৫৬ Letter form J. Forlong, Esq., Indigo Planter, to L.R Tottenhum, Esq., Magistrate of Zillah Nuddea (dated the 23rd November 1859), SRGB *Indigo*, Pt.I, p. 281.

৫৭ Nurul H. Choudhury, *op.cit*.,p. 97

৫৮ M.K. Chanda, *op.cit*., p. 49; D×…Z, Nurul H. Choudhury, *op.cit*.,p. 97

৫৯ *Englishman,* June 8, 1860; D×…Z, Blair B. Kling, *op.cit*., pp. 98-99

৬০ Blair B.Kling, *op.cit*., p. 201

৬১ নীল দর্পণ নাটকে নাট্যকারের নাম ছিলো না। এর অনুবাদেও নাট্যকার, অনুবাদক বা প্রকাশক কারো নাম মুদ্রিত হয়নি। এতে শুধুমাত্র মুদ্রাকরের নাম ছিল। নীলকরদের প্রতিনিধি ল্যান্ড হোল্ডর্স এন্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশনের সচিব ফার্গুসন এবং ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেড বাদি হয়ে মুদ্রাকর সি এইচ ম্যানুয়েলের নামে মানহানির মামলা দায়ের করেন। (দেখুন, Blair B.Kling, *op.cit*., p. 202) মোঃ রেজাউল করিম, *যশোর জেলায় নীল চাষ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৫

৬২ Kumud Behari Bose, *Indigo Planters and All about Them,* (Calcutta: A.N. Andini, 1903), p. 52

৬৩ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট ওয়েল্স আদালতে বসে এই মন্তব্যটি করেন। (দেখুন, Blair B.Kling, *op.cit*., p. 210)

৬৪ Kumud Behari Bose, *op.cit,* Apendix, p. 52

৬৫ সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯৩; মফিজুল্লাহ কবীর, *নীল বিদ্রোহ*, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬), পৃ. ২০৯